হিন্দু সংস্কৃতি
ও পরিবেশ

হিন্দু সংস্কৃতি ও পরিবেশ

যে কেউ খোলা চোখে তাকালে আধুনিক বিশ্বের চতুর্দিকে নানা ধরনের পরস্পর বিরোধী বৈপরীত্য নজরে পড়তে বাধ্য। যেমন সাধারণভাবে মানুষের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য সহজেই এখন পাওয়া যায়। তবু মানুষ সুখী নয়। তার চাহিদা তো মিটছেই না, উল্টে ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রজীবনে সে আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। কারণ মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির অশুভ প্রতিযোগিতা বিশ্বজুড়ে চলছে। অবাধে ধ্বংস করা হচ্ছে অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ, ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের মাত্রা বিপদজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতির নিজস্ব জীবনদায়ী ভারসাম্যের রক্ষা কবচ বিনষ্টকারী এই পরিবেশ দূষণ আজ নিশ্চিতভাবে মানব সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

কেন এমন হল?

বর্ত্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে একটা কথা স্পষ্ট যে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় কোথাও একটা বড় গলদ রয়েছে। যে কোন সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম হয় কোন বিশেষ দর্শন বা চিন্তনের মাধ্যমে, সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আধুনিক জীবনযাত্রার গলদের বীজ লুকিয়ে আছে ভ্রান্ত চিন্তাধারায়, ভুল সমাজ দর্শনে। আসুন, খুঁজে দেখা যাক কি এই ভ্রান্তি। কোথায় সেই গলদ।

আজকের দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা, জীবনযাত্রা সব কিছুই গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্যের প্রভাবে পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের আদর্শে। ভোগবাদী এই জীবন দর্শন সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক এক দৃষ্টিভঙ্গী। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও সমন্বয়কে সেতো মানে না।

পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক বিশ্বদর্শন

দীর্ঘ আড়াই শতক ধরে পাশ্চাত্যের এই যান্ত্রিক জীবনদর্শন আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পশ্চিমের এই ভোগবাদী জীবনদর্শনকে পরম সমাদরে আজ আমরা গ্রহণ করেছি। আদর্শ হিসাবে মেনে নিয়েছি। আমরা বিশ্বাস

করেছি যে সমাজ ও প্রকৃতিকে যথেচ্ছভাবে শোষণ করেই সার্থকভাবে বেঁচে থাকা যায়। এই যান্ত্রিক দর্শন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে এই বিশ্বের যাবতীয় সম্পদের উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি কেন্দ্রিক এই যান্ত্রিক পাশ্চাত্য দর্শনের বিষময় ফল আজ আমরা হাতে হাতে পাচ্ছি। শোষকের লোভ ও শোষিতের হাহাকার আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রার পরিকাঠামোকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। ভোগ্যবস্তুর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে উৎপাদন বৃদ্ধির লাগামছাড়া প্রতিযোগিতা বিশ্বজুড়ে চলেছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত এই উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা বিশ্বকে এক ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের দ্বারা মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছে।

বিপন্ন বিশ্ব পরিবেশ

প্রাকৃতিক সম্পদ দুই প্রকারের। স্থায়ী ও অস্থায়ী। অর্থাৎ একটির যোগান অফুরন্ত, অন্যটি খরচ হয়ে গেলে আর প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হয় না। যেমন কয়লা বা অন্যান্য খনিজ সম্পদ। ভোগ্যপণ্যের যোগান দিতে বিশ্বজুড়ে এই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ বেহিসাবীভাবে খরচ করা হচ্ছে। আর এই অধিক থেকে অধিকতর উৎপাদনের প্রতিযোগিতার বর্জ্য পদার্থ বা বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে পাচ্ছি জীবন ধ্বংসকারী পরিবেশ দূষণ। বিষাক্ত হয়ে পড়ছে আকাশ বাতাস জল। মহাকাশে বিচ্ছুরিত মারাত্মক অতি বেগুনি রশ্মীকে প্রতিহত করে পৃথিবীর বায়ুস্তরের ওপরে থাকা ওজন গ্যাসের আচ্ছাদন; এই আচ্ছাদন আমাদের পৃথিবীর আকাশে না থাকলে ভূপৃষ্ঠে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতো না। পৃথিবী এমন শষ্য-শ্যামলা হতো না। মহাকাশের অতি বেগুনি রশ্মির অবাধ অনুপ্রবেশ সুন্দর প্রাণময় এই গ্রহকে শুষ্ক প্রাণহীন মরুভূমিতে পরিণত করতো। জীবনদায়ী এই মূল্যবান ওজনের আচ্ছাদনে সহস্র ছিদ্র সৃষ্টি করেছে পরিবেশ দূষণ। ছিদ্রপথে প্রতিনিয়ত ঢুকছে প্রাণঘাতি অতি বেগুনি রশ্মি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই দূষণের নাম দিয়েছেন "গ্রীন হাউস এফেক্ট"। এ ছাড়া শিল্প প্রকল্প গড়ে তোলার নামে যথেচ্ছভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস চলেছে। গাছের শিকড় ভূমিক্ষয় রোধ করে। গাছ কেটে ফেলায় ভূমিক্ষয় ঠেকানো যাচ্ছে না। বনাঞ্চল প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। বাতাসে অক্সিজেনের সরবরাহ

অব্যাহত রাখে। সব জেনেও ভোগবাদী পাশ্চাত্য দুনিয়ার প্রভাবে আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করে ভোগের লালসায় উম্মত্তের মত আচরণ করে চলেছি। দুনিয়া থেকে বহু প্রাণী আজ বিলুপ্ত। কারণ আমাদের মাত্রাছাড়া ভোগের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছে ব্যাপক পরিবেশ দুষণের। এই দুর্নিবার লোভ আর ভোগের আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে পশ্চিমের যান্ত্রিক জীবন দর্শন। যে জীবন দর্শনের অন্ধ অনুসরণ আমাদের নিয়ে চলেছে এক নিশ্চিত ধ্বংসের পথে।

অন্ধ দৌড়

নগর সভ্যতার বিকাশের নামে বিনাশের পথে এক অন্ধ দৌড় শুরু হয়েছে। কিন্তু এই নাগরিক সভ্যতা ক্ষণস্থায়ী। সভ্যতার নামে আমরা আজ মৃত্যুর মহামিছিলে যোগ দিয়েছি। প্রকৃতি দ্রুত ভারসাম্য হারাচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের নবীকরণ হচ্ছে না। দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবু আমাদের চেতনা নেই। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট সোয়েইতজার (Albert Schweitzer) দুঃখ করে বলেছিলেন, "মানুষ আজ বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। সে তার ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। দেখলেও প্রতিকারের ক্ষমতা হারিয়েছে। একদিন সে এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংস করবে।" নিঃসন্দেহে এ সবই পাশ্চাত্য দর্শনের প্রত্যক্ষ কুফল।

পূর্বের দর্শনই সঠিক পথ

এক মহাপ্রলয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা যখন সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা স্মরণ করি তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। পশ্চিমের যে সভ্যতার বড়াই করা হয় তা মাত্র কয়েক শতাব্দীর। ভারতের সভ্যতা, দর্শন, চিন্তা গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছর আগে। শুধু ভারত নয়, পূর্ব বিশ্বের চীন জাপানের সভ্যতাও প্রাচীন ও উন্নত। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে পূর্ব দেশের এইসব মহান সভ্যতা মহাকালের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে কি ভাবে তার দীপশিখা হাজার হাজার বছর ধরে প্রজ্বলিত রেখেছে। যদি পাশ্চাত্যের শিক্ষা সভ্যতা বিনাশের কারণ হয় তবে কি পূর্ব দেশের মহান সভ্যতার জীবন দর্শনই কি আমাদের বাঁচার পথ দেখাবে? অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর— এক কথায় হ্যাঁ।

পূর্ব ও পশ্চিমের জীবন দর্শন সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিমের দর্শন ভোগবাদী। পার্থিব সম্পদের একছত্র ভোগাধিকার এই দর্শনের লক্ষ্য, মূল শিক্ষা। পূর্বের দর্শন বিশ্ব প্রকৃতিকে নির্জীব পদার্থ বলে মনে করে না। বিশ্ব

প্রকৃতি সজীব, সম্পূর্ণ, প্রাণময়। মানব জীবনের সঙ্গে আত্মিক ও জৈবিক বন্ধনে যুক্ত এক মহান সত্ত্বা। হিন্দু, বৌদ্ধ,জৈন, তাওয়িস্ট, সিন্টো সমস্ত ধর্মীয় দর্শনে একই কথা বলা হয়েছে। পূর্বের সমস্ত ধর্মেই প্রকৃতি ও মানব অভিন্ন বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই অদ্বৈত তত্ত্বের মূল কথা হলো ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নেই। মানুষ, প্রাণীজগত, আকাশ, বাতাস সব কিছুই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ, এরা কেউ পৃথক নয়। সকলেই সেই এক জগৎপিতার সন্তান। পূর্বের সব ধর্মই মেনেছে মানুষের শরীর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের তপস্যার উপযুক্ত আধার। শিক্ষা দিয়েছে ঈশ্বরে বিলীন হয়ে মোক্ষলাভের সাধনায়। বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসনে সাধনার পদ্ধতিতে হয়তো কিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের কারণ সেইসব দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও সামাজিক জীবনযাত্রার ভিন্নতা। কিন্তু পূর্বের সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ। পরমা প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলন। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ ভিন্ন হতে পারে। তাতে কিছু যায় আসে না।

সত্য জ্ঞান

বহু সহস্র বছর আগে ভারতীয় ঋষি-দার্শনিকরা এই মহান সত্যের প্রকৃত রূপটি অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নিছক নিষ্প্রাণ বস্তু হিসাবে কল্পনা করেননি। তাঁরা বলেছিলেন এই বিশ্ব প্রকৃতি যা কিছু তোমার চোখের সামনে দেখছো সবই মহামায়ার মায়া। কিছুই সত্য নয়। এর কিছুই থাকবে না। এই জগৎ সংসার সদা পরিবর্তনশীল। আমাদের ইন্দ্রিয় এই পরিবর্তন, মায়ার এই ছলনা বুঝতে পারে না। যেমন অন্ধকারে দড়িকে সাপ মনে হয় তেমনি পরম ব্রহ্ম নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই রূপের কোনটি সত্য আর কোনটি মায়া আমরা বুঝে উঠতে পারিনা। কারণ জীব মায়ায় আবদ্ধ।

মহাজ্ঞানী ভারতীয় ঋষিরা তাই উপদেশ দিয়েছেন এই মায়া মুক্ত হয়ে পরম সত্যকে জানার চেষ্টা করো। এই তোমার সাধনা, এই তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক। ভোগের আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয় সুখ পরিত্যাগ করো। তবেই তুমি মায়াজাল ছিন্ন করে সত্যের সন্ধান পাবে। ভারতীয় ঋষিরা জীবন থেকে আনন্দ, সুখ ও তৃপ্তি ত্যাগ করতে বলেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন মানুষ ইন্দ্রিয় লালসা, ভোগের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করুক। কারণ এই ইন্দ্রিয় সুখ ক্ষণস্থায়ী।

মানুষ সেই পরমানন্দের সন্ধান করুক যা চিরস্থায়ী। কারণ সেই আনন্দ সেই সুখ অতীন্দ্রিয়।

কি ভাবে সম্ভব

কি ভাবে সেই অতীন্দ্রিয় সুখের সন্ধান পাওয়া যাবে? ভারতীয় দর্শনেই এই পথের সন্ধান বলা আছে। আমাদের মন ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগায়। যা কিছু ভোগ্য বস্তু দেখি তা নিজের অধিকারে আনতে মনই আমাদের প্ররোচিত করে। মানুষের মন সদাই চঞ্চল। সে এক থেকে অনেক ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হয়। তার আকাঙ্ক্ষার কোন নিবৃত্তি নেই। চার পাশে যা কিছু দেখছি সবই ভোগ করার বাসনায় আমরা প্রকৃতির সব সম্পদ লুণ্ঠন করে পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছি। তবু আমাদের কামনা বাসনার নিবৃত্তি হয়নি। বরং চাহিদা বেড়েই চলেছে।

এই সমস্যার সমাধান সহজ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদার নিয়ন্ত্রণ করো। চাহিদা কমলে ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন কমবে। এর জন্য নিজের মনকে সংযত করতে হবে। কারণ মনই তোমার পরিচালক। তোমার প্রভু। তাকে নিয়ন্ত্রণে না আনলে ভোগের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। পরিণামে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ সবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। মনে রাখতে হবে, লাগামছাড়া চাহিদা মেটাতে বিশ্বজুড়ে প্রকৃতির সমস্ত সম্পদ অবাধে লুণ্ঠন চলেছে। এই সম্পদ এক দিন শেষ হবে। কলকারখানায় ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উন্মত্ত প্রতিযোগিতা চলেছে। ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বিপদজনকভাবে বেড়ে চলেছে। পরিণামে এক সময় পৃথিবী থেকে প্রাণের অস্তিত্ব মুছে যাবে। বাঁচতে গেলে আগে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগের ইচ্ছাকে সংযত করো। চাহিদা কমলে স্বাভাবিকভাবেই কলকারখানায় অধিক উৎপাদনের প্রতিযোগিতা কমবে। প্রাকৃতিক সম্পদের বেপরোয়া লুণ্ঠন বন্ধ হবে। তখন প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই সম্পদের ক্ষতির পূরণ হবে। ঋতুচক্র মানুষের ছড়ানো দূষণের বিষকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এরজন্য প্রকৃতিকে সময় দিতে হবে।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে সকলেই স্বেচ্ছায় আত্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ্য পণ্যের চাহিদা কমিয়ে ফেলবে। এই রকম কিছু ভাবা অলীক কল্পনা মাত্র। তাই প্রথমদিকে নানাভাবে অতিরিক্ত

চাহিদা নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। ব্যক্তি, সমাজ, পরিবেশের কল্যাণে তা করলে কোন অপরাধ হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ভোগবাদী রাষ্ট্রও আজ তা বুঝেছে। তাই বিশেষ বিশেষ ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে চাহিদা কমাতে নানারকম করছাড় ও অন্যান্য সরকারী সুবিধা দিচ্ছে। যেমন পলিথিন ব্যাগের ব্যাপক ব্যবহার পরিবেশ দূষণ করে। মার্কিন সরকার ঘোষণা করেছেন যে সেখানের সুপার মার্কেটে কেনাকাটার জন্য আসা ক্রেতারা যদি বাড়ি থেকে নিজের ক্যারি ব্যাগ বা বাজারের থলি নিয়ে আসেন তবে তাঁরা দামের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় পাবেন। অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ বন্ধ করতে প্রয়োজনে পুরস্কার ও শাস্তি উভয়ের প্রয়োজন আছে।

আমাদের পূর্বপুরুষের সাধারণ উপলব্ধি

আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সমস্যাটির গুরুত্ব বুঝেছিলেন, বিপদে পড়ে নয়। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যের মূল শিক্ষাটিই ছিল ঈশ্বর তোমাকে যতটুকু দিয়েছেন তাই নিয়ে সুখে থাক। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু ভোগ করার ইচ্ছা ত্যাগ করো। যা তোমার নয় তা অধিকার করা থেকে বিরত হও। প্রাচীন ভারতে মানুষের চাহিদা নিয়ন্ত্রণে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়নি। সেকালের সামাজিক শিক্ষাই এমন ছিল। ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা ছিল। শ্রেয়সী ও প্রেয়সীর দ্বন্দ্বে সর্বদা জয় শ্রেয়সীর হতো। মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার এই শিক্ষারই নাম "সাধনা"। আর এই সাধনার পদ্ধতি বা সোপান হচ্ছে "যোগ"। একে অন্যের পরিপূরক। দুয়ে মিলে শিক্ষার নাম যোগ সাধনা।

ভোগ নয় ত্যাগ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের মূল পার্থক্যটাই এখানে। পশ্চিমের তথাকথিত সভ্যতার মূল কথাই হলো যথেচ্ছ ভোগ। অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে বস্তুবাদী জীবনযাত্রা। প্রাচ্যের দর্শন বলে ত্যাগের মধ্যেই যথার্থ ভোগ হয়। জীবনের লক্ষ্য হোক পরমাত্মার আশীর্বাদ, পরম শান্তিলাভ। তুচ্ছ পার্থিব বস্তুর ভোগ জীবনে শান্তি আনেনা। তাই ভোগসুখের ইচ্ছা ত্যাগ করো। জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি চাহিদা যেন না থাকে। এই কথাটা আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে চিন্তাধারার রঙ

হোক গৈরিক। তবেই দূষণমুক্ত পরিবেশে সুস্থ জীবনযাপন সম্ভব। সনাতন ভারতীয় জীবন দর্শনে গৈরিক রঙ ত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতীক। আধুনিক বিশ্বে দূষণ মুক্ত পরিবেশকে গ্রীন বা সবুজ রঙ বলা হয়। তাই গৈরিক চিন্তনই পারে আধুনিক বিশ্বে গ্রীন লিভিং বা দূষণহীন সমাজ ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে। ভোগ নয়, ত্যাগের মাধ্যমেই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব। ভোগ প্রকৃতিকে শোষণ করে। ত্যাগ প্রকৃতিকে রক্ষা করে। ভোগ থেকে অধিকারবোধের জন্ম হয়। মানুষকে হিংসায় প্ররোচিত করে। ত্যাগ শান্তি দেয়। মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ সুস্থ শৃঙ্খলা গড়ে তোলে।

উপনিষদের পথ

প্রকৃতির স্বাভাবিক বিবর্তনই হিন্দু দর্শনের মূল তত্ত্ব। প্রকৃতির বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই জীবন সহজভাবে বিকশিত হোক। প্রকৃতি থেকে বিছিন্ন হয়ে নয়। হিন্দু ধর্মের শিক্ষা, সংসারে গৃহী সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করো। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবনকে আরও উন্নত করে গড়ে তোল। হিন্দু ধর্মের গভীরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় কত অমূল্য রত্ন সেখানে ছড়িয়ে আছে। জীবাত্মার কল্যাণে এমন ধর্ম শিক্ষা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন এক মহান ধর্মের শরিক হিন্দু বলে গর্বিত হতে হয়।

হিন্দু দর্শন শুধু হিন্দুর জন্য নয়। হিন্দু জীবনবোধ সমগ্র মানব জাতির জন্য। হিন্দুর জীবনযাত্রার শিক্ষা গ্রহণ করলে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অন্য রূপে দেখা যাবে। প্রকৃতি তখন আর বহুভোগ্যা রমনী নয়, স্নেহময়ী মাতা রূপে মানব সমাজের কাছে প্রতিভাত হবে। মানব ও প্রকৃতি তখন পরমেশ্বরের অদ্বৈত রূপ হয়ে দেখা দেবে। ঐক্যবদ্ধ জীবন তখন পরস্পরকে সম মর্যাদায় ভালবাসতে শেখাবে। ব্যক্তি অধিকারবোধের পরিবর্তে সমষ্টির অধিকারবোধের জন্ম দেবে। উপনিষদের প্রথম ছন্দবদ্ধ বানী, "এই বিশ্বের সমস্ত কিছুতেই ঈশ্বরের রূপ প্রতিভাত। সবই ঈশ্বরের দান। প্রতিটি বস্তুতেই সকলের সম্মান অধিকার। তাই সকলে একত্রে তা ভাগ করে নাও। অন্যের প্রাপ্য বস্তু জোর করে অধিকার করো না।" অর্থাৎ গৈরিক চিন্তনই দূষণমুক্ত গ্রীন লিভিং বা সবুজ জীবনযাত্রা বিশ্বে গড়ে তুলতে সক্ষম।

গীতার পথ

মানব ও প্রকৃতির এই বন্ধন ও পারস্পরিক নির্ভরতার কথাই ভাগবত গীতার উপদেশে আছে। গীতার উপদেশে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। এই যজ্ঞের বিধি নিয়ম এমন যে তা প্রাকৃতিক চক্রকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে, গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের বারো অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "পরমা প্রকৃতি আমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন কেউ যদি তা ফিরিয়ে না দেয় তবে সে চোর ছাড়া আর কি?" সত্যি, প্রকৃতি আমাদের নির্মল বাতাস শুদ্ধ পানীয় জল দিয়েছে। সুতরাং বাতাস জলকে নির্মল পবিত্র রাখা আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। মাটিতে জৈব প্রক্রিয়া ফসল ফলাতে মানুষকে সাহায্য করে। প্রকৃতির এই জৈব প্রক্রিয়া খাদ্য সরবরাহ করে মানবের জীবন- চক্রকে অব্যাহত রেখেছে। প্রাকৃতিক জৈব-প্রক্রিয়ায় বিষ ছড়িয়ে তাকে ধ্বংস করলে জীবন-চক্রকেই ধ্বংস করা হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই গীতার বাণীতে বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রকৃতির জীবনচক্রে বাধা দেয় সে ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত মহাপাপী।" মাটি, জল, বাতাসে দূষণের বিষ ছড়ালে প্রাকৃতিক জীবনচক্র বিঘ্নিত হয়। তাই গীতার মহান উপদেশ, ইন্দ্রিয় সুখভোগের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করো। তোমার লোভ, ভোগেচ্ছা প্রকৃতিকে ধ্বংস করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক পুরুষোত্তম সকলের পরম মিত্র। তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না। তিনি সর্বদা হিতকারী।

গীতার বাণী অনুসারে সর্বজনের হিত চিন্তা সত্য হলে প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ বা লুন্ঠনের প্রশ্ন আসে না। যেমন দুগ্ধবতী গাভীকে মাংসের জন্য হত্যা করা যেতে পারে। হত্যা করলে বড় জোর একবারই মাংস পাওয়া যেতে পারে। গাভীটিকে আর পাওয়া যাবে না। অথচ দুগ্ধবতী গাভীটিকে সযত্নে রক্ষা করলে দীর্ঘ বহু বছর ধরে দুধের অমৃতধারা ভোগ সম্ভব। ভারতীয় হিন্দু এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করেছিল। হিন্দু তাই গো সম্পদকে রক্ষা করেছে। মাংসের লোভে হত্যা করাকে অধর্মীয় মহাপাপ বলে ঘোষণা করেছে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁর "একাত্ম মানবতাবাদ" প্রসঙ্গে বলেছেন, "প্রকৃত সভ্যতার বিস্তার কখনো প্রকৃতিকে শোষণ করে হয় না। প্রকৃতিকে রক্ষা করে তাকে সযত্নে পুষ্ট করেই তার জয়যাত্রার রথ এগিয়ে চলে। প্রকৃতির দানকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেই মানব জীবনকে সচল রাখার পদ্ধতি ও নীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ।"

শিক্ষার সাফল্য

হিন্দু দর্শনের বাণী, গীতা ও উপনিষদের উপদেশগুলিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত করতেই তাকে ধর্মাচরণের অঙ্গ করা হয়। ধর্ম, হিন্দু-দর্শন এবং সমাজের প্রধান যোগসূত্র। ধর্মাচরণের মধ্যেই এই মহান দর্শনের উপলব্ধি বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসনে হিন্দুর কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের কথা সহজভাবে বলা আছে। এই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের তালিকা পড়লে অবাক হতে হয় এই দেখে যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের আচার আচরণের কথা ভাবা হয়েছে। সংসারে সরল ও সত্য পথে চলতে গেলে কেমন আচরণ আমাদের করা উচিত তার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ একমাত্র হিন্দু ধর্মীয় অনুশাসনেই পাওয়া যায়।

হিন্দু ধর্মে এই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের দৈনন্দিন তালিকা অনুসরণের মধ্যেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার বীজমন্ত্র আছে। এমন অনেক কর্ত্তব্য-কর্মের কথা বলা আছে যাতে বন জঙ্গল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। ভূমিক্ষয় রোধ হয়। জল ও বাতাস নির্মল থাকে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। অকারণ পশু হত্যায় ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

ধর্মীয় অনুশাসন ও পরম্পরা

প্রত্যেক হিন্দুকেই তার সামাজিক জীবনে কিছু ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিদিন অথবা বিশেষ সময়ে মেনে চলতে হয়। এইসব অনুশাসন বা নিয়ম পদ্ধতি হিন্দুর পূজার্চ্চনার অঙ্গবিশেষ। পূজা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতিকে রক্ষা করা, তাকে ধ্বংস করা নয়। হিন্দু তাই গবাদি পশুকে নিছক পশু হিসাবে দেখে না, গোমাতা রূপে পূজা করে। হাতি, ঘোড়া, সাপ, পাখি সবই দেবতার বাহন অথবা দেবতা। বট, অশ্বত্থ, তুলসী পূজিত হয়। নদী, পর্ব্বত, ভূমি, যন্ত্রপাতি, বই, কলম ইত্যাদি সবই হিন্দুর পূজার বস্তু। সমস্ত পূজা বস্তুকে রক্ষা করাই হিন্দুর পবিত্র কর্ত্তব্য। হিন্দু তাই প্রকৃতির সম্পদকে ধ্বংস করতে পারে না। তার ধর্ম, তাকে এমন শিক্ষা দেয়নি।

ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের মতই হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস ও পরম্পরা গড়ে উঠেছে। ধর্ম বিশ্বাসের এই সুদীর্ঘ পরম্পরা প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সামাজিক

জীবনের সর্বক্ষেত্রে, যেমন কৃষি, ফলফুলের বাগিচা, ভেষজ, গৃহ নির্মাণ, ধর্মীয় পরম্পরার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এই পরম্পরার মত সুপ্রাচীন বিশ্বাস পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করেছে। এই জাতীয় অনেক বিশ্বাসের যুক্তি বা কারণ খুঁজে পাওয়া হয়তো শক্ত। কিন্তু যদি সেই বিশ্বাস পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে তবে তা গ্রহণ করা উচিত। যেমন মহারাষ্ট্রে বেশ কিছু মন্দির আছে পাহাড়ের চূড়ায়। এই সব মন্দির, পাহাড় ঘিরে আছে বনাঞ্চল। সেখানের মানুষ বিশ্বাস করে জঙ্গ-লের গাছ কাটলে বা বন্য পশু হত্যা করলে দেবতার অভিশাপ নেমে আসবে। মন্দির সংলগ্ন বনের গাছ, পশু, পাখি সবই দেবতার আশ্রিত সন্তান। যুগ যুগ ধরে জঙ্গল রক্ষা করায় এখানে ভূমিক্ষয় হয়নি। বাতাস সর্বদা নির্মল ও শীতল। প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখন এই বিশ্বাসকে যদি যুক্তিবাদীরা অন্ধ বিশ্বাস বলে বিদ্রুপ করে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ এই যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসই যুগ যুগ ধরে পরিবেশকে রক্ষা করে চলেছে।

আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ

এই ভাবেই হিন্দুর ধর্মবোধে কর্ম ও পাপের ধারণা গড়ে উঠেছে। যদি কেউ গাছ কাটে অথবা অকারণে পশু হত্যা করে, তবে তাকে পাপের দায় মাথায় নিতে হবে। সত্যি কি এই কর্মের জন্য পাপ হয় অথবা নরকে পচতে হবে? যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। কিন্তু যুক্তি তর্ক দিয়ে যে কাজ হয় না তা বিশ্বাসে সম্ভব হয়। নদী, মাটি, পর্বত ইত্যাদি সবই জড় পদার্থ। তবে ভূমি, নদীকে হিন্দু মাতৃরূপে পূজা করে কেন? জড় প্রাকৃতিক বস্তু কিভাবে মাতা হতে পারে? হ্যাঁ, এখানেই হিন্দু ধর্মশিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব। প্রকৃতিকে মাতৃরূপে দেখার শিক্ষা পেলে তাকে ভোগ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। প্রাচ্যের হিন্দু প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের মধ্যে ঈশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষ করে। আর পাশ্চাত্যের সভ্যতা প্রকৃতিকে ভোগ্যা নারী রূপে দেখেছে। শক্তি প্রয়োগে তাকে অধিকারের চেষ্টা করেছে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে হিন্দু যে সব গাছ-গাছড়াকে দেবজ্ঞানে পূজা করে তার অধিকাংশই ভেষজ গুণসম্পন্ন, অথবা ধর্মাচরণে তার পত্রপুষ্প লাগে। সাধারণভাবে বিশেষ গুণসম্পন্ন এইসব গাছ-গাছালি হিন্দুর বাড়ির চারপাশে লাগানো হয়। যুক্তিবাদীরা বলবেন বাড়ির চারপাশে গাছ লাগানো

ভাল কাজ। তবে তার সঙ্গে ধর্মকে জড়ানোর কোন অর্থ নেই। হাস্যকর ব্যাপার। হিন্দু তা মনে করে না। হিন্দু ধর্মের প্রবক্তারা শুধু মহাজ্ঞানী ছিলেন না, তাঁরা বাস্তববাদী ছিলেন। পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে তাঁরা প্রকৃতির সম্পদকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। আজকের যুক্তিবাদীরা একটা কথাতো স্বীকার করবেন যে নিজক আবেদন-নিবেদন বা যুক্তি তর্কে মানুষকে পরিবেশ রক্ষায় বাধ্য করা যাচ্ছে না; বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য জগৎ পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারেনি। অথচ প্রাচীন হিন্দু-ভারত শুধু ধর্ম বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে সে কাজ করে দেখিয়েছে।

হিন্দু ধর্মের প্রবক্তারা সেই সুপ্রাচীনকালেই উপলব্ধি করেছিলেন যে যা কিছু কল্যাণময় তা মানুষের গ্রহণযোগ্য করতে গেলে ধর্মীয় আচার অনুশাসনের মধ্য দিয়েই প্রচার করতে হবে। তাঁরা জানতেন সাধারণ মানুষ যুক্তি তর্কের কচকচিতে যেতে চায় না। তাদের কাছে ঋষি বাক্য অলঙ্ঘনীয়। ঋষির উপদেশ পালন করাই ধর্ম। ধর্মীয় আচার আচরণ গড়ে উঠেছে ঠিক এইভাবে। হিন্দুর সামাজিক জীবনে ধর্মের এক বিশেষ আসন পাতা আছে। হিন্দুর জীবন ও ধর্ম অভিন্ন। কারণ জন্ম থেকে মৃত্যু হিন্দুর দৈনন্দিন জীবন ধর্মীয় অনুশাসনের শৃঙ্খলায় পরিচালিত। সুতরাং যা কিছু প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় প্রয়োজন, তার সবই পূজা পদ্ধতি, আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে হিন্দু ঋষিরা যুক্ত করেছিলেন। ভেবে অবাক হতে হয় যে সেকালের ঋষিরা কত উচ্চস্তরের মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। যুক্তি তর্কের বৃথা কচকচিতে না গিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার কল্যাণে কেমন সার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

ত্যাগ ও ভোগের সুসমন্বয়

হিন্দুত্ববাদের মূল ভিত্তিই গড়ে উঠেছে ত্যাগের আদর্শে। তবে কি হিন্দুত্ববাদে ভোগের কোন স্থানই নেই? হিন্দু পরজন্ম বা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তার অর্থ কি তারা ইহজন্মে ইতর প্রাণীর মত জীবন কাটায়? মোটেই নয়। হিন্দুর গৌরবময় অতীত ইতিহাস সে কথা বলে না। প্রাচীন ভারতে হিন্দুরা এতটাই স্বচ্ছল জীবনযাপন করতেন যা প্রতিবেশী দেশের মানুষের কাছে ঈর্ষনীয় ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে সুদূর অতীতে বিদেশী বণিকের দল

ভারতে এসেছে মসলা, সিল্ক, হীরার সন্ধানে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জ্জনের জন্য নয়। একমাত্র ভারতেই সেরা মানের ভোগ্য পণ্য পাওয়া যেত। বিশ্বের আর কোন দেশে নয়। বৃটিশ বণিক এবং রাজশক্তি ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল। অর্থাৎ বিপুল সম্পদ আমাদের ছিল বলেই তা লুঠ করা সম্ভব হয়েছিল।

ত্যাগের আদর্শে গড়ে ওঠা হিন্দু সমাজে ভোগের উপকরণের এমন সহাবস্থান কিভাবে সম্ভব? হ্যাঁ, এই সহাবস্থান, এমন সুসমন্বয় সম্ভবপর হয়েছিল মহান হিন্দুধর্ম প্রবক্তাদের দূরদৃষ্টির জন্য। এই মহাজ্ঞানী মহাজনেরা বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা জানতেন সমাজের সাধারণ গৃহী মানুষের দুর্বলতা কোথায়। কতটা তারা গ্রহণ করতে পারবে আর কতটা পারবে না। সাধারণ মানুষ জৈবিক কামনা বাসনা, ইন্দ্রিয়সুখ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারে না। জোর করে ইন্দ্রিয় বাসনা ত্যাগে বাধ্য করলে মানুষের মনে, সমাজে, বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে; বিকৃত বাসনা জীবনকে বিষাক্ত করে তুলবে।

হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞরা তাই ভোগের ইচ্ছাকে পুরোপুরি বর্জন করার কথা সাধারণ গৃহী মানুষকে বলেনান। বলেছেন, ভোগের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগের উপকরণ অমঙ্গলের কারণ হয়। হিন্দু ধর্মের অনুশাসনে গৃহী সংসারী মানুষের সুখী জীবনযাপনের নানা উপদেশ আছে। এই সব অনুশাসনে ভোগের সীমারেখা টানা আছে। যার অর্থ, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট না করে পার্থীব বস্তু ভোগ করা যেতে পারে। যদি তোমার ভোগ সুখ পরিবশেকে দূষিত না করে, প্রকৃতির নিজস্ব চক্রকে ধ্বংস না করে, তবে তা মোটেই আপত্তিকর নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গীতার বাণীতেই এমন নিয়ন্ত্রিত ভোগের উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, তোমার বাসনা, ভোগেচ্ছা যদি ধর্ম বিরুদ্ধ না হয় তবে তা নির্ভয়ে পালন করো। হিন্দুধর্মে বিষয় সম্পত্তি, ভোগ সুখ থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে থাকতে বলেনি। শুধু বলেছে তোমার লোভ, লালসা যেন সীমাহীন না হয়। কারণ তা' প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এইভাবে ধর্ম মানুষের ভোগের সীমাহীন ইচ্ছার মুখে শৃঙ্খলার লাগাম পরিয়ে দিয়েছে। ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে।

মহান সাফল্য

অবাক হতে হয় যখন দেখি যে ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও প্রাচীন ভারতে হিন্দু জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থ, সম্পদ ও ঐশ্বর্যের শিখরে পৌঁছেছিল। সারা বিশ্ববাসী আজ এক বাক্যে স্বীকার করে যে ভারতীয় হিন্দু গণিতজ্ঞরাই গণনার ক্ষেত্রে "শূন্যের" ব্যবহার জগৎকে শেখায়। গণিতশাস্ত্রে ভারতের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, ভাস্কর্য, জাহাজ নির্মাণ, নৌচালনা, মন্দির নির্মাণ, রাস্তা, সেতু নির্মাণ, যুদ্ধবিদ্যা সর্বক্ষেত্রে ভারত ছিল বিশ্বসেরা। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ছিল অতি উন্নতমানের। ভারত কৃষি প্রধান দেশ। সমাজ ব্যবস্থা ছিল কৃষি নির্ভর। তাই সেই আদিকাল থেকে কৃষির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে ভারতবাসী অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ভারতীয় কৃষির সেচ ব্যবস্থা প্রাচীন বিশ্বে পথ প্রদর্শক ছিল। ভূস্তরের নিচের সঞ্চিত জল নষ্ট না করে কিভাবে জলসেচ করা যায় তা উদ্ভাবন করেছিল নিরক্ষর ভারতীয় চাষীরা। জৈব সারের সুষম ব্যবহার কিভাবে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে তা হাতেকলমে করে তারা বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছিল।

শুধু বৈষয়িক নয়, প্রাচীন হিন্দু ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনও ছিল উন্নতমানের। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য সব কিছুই বিকশিত হয়েছিল সেকালের উন্নত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের বৈচিত্র্য আজও আমাদের চমৎকৃত করে।

জীবনমুখী কারিগরী বিদ্যা

এবং মনে রাখতে হবে প্রাচীন হিন্দু-ভারতে প্রতিটি কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের নিজস্ব পৃথক যন্ত্রপাতি ছিল। যখন আমরা বলি প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা বিদ্যা অতি উন্নত ছিল তখন বুঝতে হবে যে চিকিৎসকদের কাছে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও ছিল। উন্নতমানের যুদ্ধবিদ্যার প্রসারের অর্থ প্রাচীন ভারতের যোদ্ধারা লোহাকে কিভাবে ইস্পাতের তরবারীতে পরিবর্তিত করা যায় সেই বিদ্যা আয়ত্ব করেছিল। ভারতীয় কারিগরী বিদ্যা যে শুধু উন্নতমানেরই ছিল না, এই বিদ্যা পরিবেশ দূষণ বিরোধী, বিকেন্দ্রিত, সহজ সরল ছিল। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানী সুমেচারের কথায় প্রাচীন কারিগরী বিদ্যা জীবনমুখী ছিল।

উৎসব ও প্রকৃতি কৃতজ্ঞতার বন্ধন

জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা, কারিগরী শিক্ষায় যে সমাজ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল সেই সমাজের মানুষজন নিশ্চয় আনন্দ উৎসবের অনুরাগী ছিলেন। জীবনকে কত সহজ ও সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় তা তাঁরা জানতেন। প্রকৃতির ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে কেমন নির্মল আনন্দ পাওয়া যায় তা জানা ছিল বলেই হিন্দু বসন্ত উৎসব বা হোলি উৎসব থেকে শুরু করে দীপাবলী, মকর সংক্রান্তি ইত্যাদি উৎসব পালন প্রচলন করেছিল। এইসব সামাজিক উৎসবের সঙ্গে প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুর প্রত্যক্ষ যোগ আছে। হিন্দু প্রকৃতির বিভিন্ন রূপে মুগ্ধ হয়েছে। প্রকৃতিকে ভালবেসেছে। পূজা করেছে। দেবীরূপে বন্দনা করেছে। প্রকৃতির কাছে হিন্দু চিরকৃতজ্ঞতার বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেছে। এখানেই হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব, এখানেই হিন্দু ধর্মের মহানতা।

ঈশ্বর-প্রকৃতি-পূজা

ভারতের মহান হিন্দু সভ্যতাই একমাত্র প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের লীলা প্রত্যক্ষ করেছিল যা বিশ্বের দ্বিতীয় কোন সভ্যতায় আমরা খুঁজে পাইনি। এ কথা ঠিক যে কিছু আধ্যাত্মিক দর্শনে রূপ মুগ্ধতা বর্জনের উপদেশ আছে। কারণ মনে করা হয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির রূপে আকৃষ্ট হলে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাবে। হিন্দুর আধ্যাত্মিক দর্শন ভিন্ন। হিন্দু দর্শনে প্রকৃতিকে দেবীরূপে পূজার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে প্রকৃতি ও পরিবেশ ঈশ্বরস্বরূপা। তাঁকে দেবীর আসনে বসাও। ঈশ্বর এই বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই তিনি আছেন। তাই হিন্দু সূর্য-প্রণাম করে। সে ভোরের আকাশে লাল আবির ছড়িয়ে সূর্যোদয়ের সৌন্দর্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে মন্ত্রোচ্চারণে বন্দনা করে। ফুল, ফল, জল, নদী, সমুদ্র সব কিছুই হিন্দু ঈশ্বরের দান বলে গ্রহণ করে। প্রকৃতির ঋতুচক্রের মধ্যে সে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রকাশ দেখতে পায়। হিন্দুর দর্শনে প্রকৃতি ভোগ্যা রমণী নয়। প্রকৃতি পূজ্যা দেবী। এখানেই হিন্দু-ভারতের মহান সভ্যতা বিশ্বের অন্য সমস্ত সভ্যতা, সব দর্শনকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। এখানেই হিন্দুর জয়, হিন্দু দর্শনের বিজ্ঞান মনস্কতার সাফল্য। প্রকৃতিকে রক্ষা করলে, মানবজাতি রক্ষা পাবে এমন কথা হিন্দুই বলতে পারে, এমন ধর্ম হিন্দুই পালন করতে পারে।

নিয়ন্ত্রিত বাসনা

যা কিছু সুন্দর তার প্রতি সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হবেই। মানুষের স্বাভাবিক কামনা বাসনা, রূপতৃষ্ণাকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করেননি আমাদের ধর্মের প্রবক্তারা। সুন্দরকে উপভোগ করার ক্ষেত্রে তাই হিন্দুর কোন বাধা নেই। প্রাচীন ভারতে হিন্দুজাতি সুন্দরের যথার্থ উপাসক ছিলেন। সুগন্ধী পুষ্পমাল্য, চন্দন সুবাসিত তেল, বিচিত্র অলঙ্কার, সব কিছুই স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে ব্যবহার করতেন। হিন্দু নারীর কবরী বন্ধনের সূক্ষ্ম কলায় আধুনিক বিশ্বও বিস্মিত না হয়ে পারে না। নারীর অলঙ্কার, প্রসাধন, উন্নত হিন্দু সভ্যতার মহান ঐতিহ্য। গৃহসজ্জায় বিচিত্র সুন্দর আলপনার ব্যবহার হিন্দুরই আবিস্কার। শুধু গৃহাঙ্গনই নয়, হিন্দু তার গরু গাড়িটিও আলপনায় পল্লবে সাজাতে ভালবাসতো। সৌন্দর্যবোধ ধর্মবিরোধী ছিল না। বরং হিন্দু ধর্মের প্রবক্তারা জানতেন স্বাভাবিক কামনা বাসনাকে জোর করে দমন করার চেষ্টা করলে সামাজিক জীবনে ব্যাভিচার দেখা দেবে। তাই তাঁরা সুন্দরের প্রতি স্বাভাবিক অকার্ষণকে রুদ্ধ না করে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। নিজেকে সুন্দর করে সাজানোর সঙ্গে নিজের বাসস্থান পরিবেশকে সুন্দর করে সাজানোর শিক্ষাই তাঁরা সাধারণ মানুষকে দিয়েছিলেন। ভোগের স্বাভাবিক ইচ্ছার ক্ষয় না হলে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করা যায় না। হিন্দু বিশ্বাস করে জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে ভোগের ইচ্ছার ক্ষয় ও ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভ হয়।

বৃটিশের মস্তিক ধোলাই

বিশ্বের সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার উত্থান ও পতন ঘটেছে মহাকালের অমোঘ নিয়মে। হিন্দু সভ্যতা এর ব্যতিক্রম নয়। হাজার হাজার বছরের এই প্রাচীনতম সভ্যতার চলার পথে স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক অনাচার প্রবেশ করেছে। এইসব অনাচার, কুসংস্কারকে অস্বীকার করে সত্যকে গোপন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মনে রাখতে হবে কোন সমাজ ব্যবস্থাই সঠিক বা ত্রুটিহীন নয়। সব সমাজেই ভাল ও মন্দ দুটি দিক্ই আছে। ভারতে বিদেশী আগ্রাসনের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও ঘটেছিল। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর বাইরের আঘাত যুগে যুগে ঘটেছে। কিন্তু শেষ জয় হিন্দু-সংস্কৃতিরই হয়েছে।

কিন্তু আজ, আবার আমাদের অধঃপতন ঘটেছে। মনে হচ্ছে আমরা

আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্রের শিকড় হারিয়েছি। নিজেদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আদর্শ ভুলে পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত বস্তুবাদী জীবনের প্রতি অযথা আকৃষ্ট হয়ে আত্মধ্বংসের পথে অন্ধ দৌড় শুরু করেছি। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী ঝড় আমাদের কৃষ্টি, বিচারবোধ, জীবনযাত্রা সবকিছু ঘড়কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য দায়ী বৃটিশ রাজশক্তি। আমাদের পরাধীনতা। শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ ভারতবাসীকে বুঝিয়েছিল যে ভারতের সভ্যতা, শিক্ষা, সমাজ ব্যবস্থা সব কিছুই অতি নিম্নমানের। পাশ্চাত্যের তথাকথিত উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এলেই ভারতীয়দের সামাজিক ও আত্মিক উন্নতি ঘটবে। নতুবা নয়। বৃটিশ রাজশক্তির এই কৌশলী মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের ফলে আমরা ভুলে গেলাম যে আমাদের নিজস্ব দর্শন, চিন্তন এবং জীবনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই আত্মবিস্মৃতির ফলেই আজ ভারতের সমাজ জীবনে নানা ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভোগবাদী পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ সমাজে আজ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে যে চরম বিশৃঙ্খলা, কলুষিত পরিবেশ দেখা যাচ্ছে তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটছে ভারতীয় সমাজে। আমরা আমাদের পারিবারিক জীবনে বিচ্ছিন্নতার, আদর্শহীনতার শিকার।

নিজেকে জানো

নিয়তির কি চরম পরিহাস! ভোগ ও বস্তুবাদকে যারা জীবনের মোক্ষ বলে মনে করেছিল, পাশ্চাত্যের সেই শ্বেতাঙ্গ সমাজের আশাভঙ্গ হয়েছে। ভোগের আগুনে দগ্ধ হয়ে বুঝেছে যে আধুনিক সভ্যতা, উন্নত জীবনযাত্রার বড়াই তারা এতকাল করেছে তা অসার। ক্ষতিকারক। দুঃখের কারণ। সমাজ জীবনে প্রাচুর্যের অভিশাপ নেমে এসেছে। ভোগের উপকরণ যোগাতে যোগাতে প্রকৃতির সমস্ত মহার্ঘ সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে। পরিবেশ কলুষিত। তবু ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় নি। এই নিদারুণ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন, সুস্থ, স্থায়ী সমাজব্যবস্থা কিভাবে গড়া যায় তার পথনির্দেশ পেতে পাশ্চাত্য আজ প্রাচ্যের দ্বারে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে। কারণ পাশ্চাত্যের ভোগবাদী মানুষ বুঝেছে জীবনে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি পেতে গেলে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সঠিক পথ। অথচ এই শিক্ষা এই পথ সবই ভারতীয়দের অতি পরিচিত। সেই পরিচিত চলার পথে শাসক বৃটিশ সভ্যতা আমাদের বাধা

দিয়েছিল। হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতাকে সেকেলে অর্থহীন বলে বাতিল করতে ভারতবাসীকে প্ররোচিত করেছিল।

সময় এসেছে ভুল সংশোধনের। হিন্দুকে জানতে হবে তার গৌরবময় মহান ঐতিহ্যকে। তার সুপ্রাচীন সভ্যতাকে। যে সভ্যতা মানুষ ও প্রকৃতির মহামিলন ঘটিয়েছিল ; হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুর সমাজ ও পারিবারিক জীবনকে এক অটুট বন্ধনে ধরে রেখেছিল। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী প্রাচুর্যের হাতছানি উপেক্ষা করে আদর্শ ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। কারণ হিন্দু দর্শনেই প্রকৃতি ও তার প্রাণীজগৎ একই তারে একই সুরে বাঁধা।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত উন্নত শ্বেতাঙ্গ সমাজ আজ শান্তির সন্ধানে প্রাচ্যের মহান দর্শনের আশ্রয় নিতে চাইছে। হিন্দুত্ববাদের এমন শক্তি আছে যা ভোগবাদী দুনিয়াকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। ভারতীয় হিন্দুদের আজ পবিত্র দায়িত্ব, বিশ্ববাসীকে সেই পথে পরিচালিত করা। কারণ হিন্দু ভারতবাসী নেতৃত্ব না দিলে বিশ্বকে পরিবেশ দূষণের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে আর কে রক্ষা করবে? সকলে এসো, এই ধর্ম পালনে প্রস্তুত হও।

।। ভারত মাতা কী জয়।।

মূল্য ঃ ৫.০০ টাকা